সূরা ইবরাহীম ৬ষ্ঠ রুকুঃ ৩৫-৪১ আয়াত

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ৩৫ : ১৪

৩৫. আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন।

সাধারণ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করার পর এবার আল্লাহ কুরাইশদের প্রতি যেসব বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন সেগুলার কথা বলা হচ্ছে। এ সঙ্গে একথাও বলা হচ্ছে যে, তোমাদের প্রপিতা ইবরাহীম (আ) কোন্ ধরনের প্রত্যাশা নিয়ে তোমাদের এখানে আবাদ করেছিলেন, তাঁর দোয়ার জবাবে আমি তোমাদের প্রতি কোন্ ধরনের অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলাম এবং এখন তোমরা নিজেদের প্রপিতার প্রত্যাশা ও নিজেদের রবের অনুগ্রহের জবাবে কোন ধরনের ভ্রষ্টতা ও দুষ্কর্মের অবতারণা করে যাচ্ছো।তিনি তো এ ঘরকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য তৈরী করেছিলেন। এ ইবরাহীম যার জন্য এ এলাকা আবাদ হয়েছে তিনি তো প্রচণ্ডভাবেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাতের বিরোধিতা করে গেছেন। তিনিই তো মক্কার জন্য নিরাপত্তার দোআ করেছেন। [আল-বাহরুল মুহীত, ইবন কাসীর]

এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দুটি দোআ উল্লেখ করা হয়েছে।

<u>সূরা ইবরাহীম এখানে প্রথম দো'আঃ</u> (رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا) অর্থাৎ হে আমার রব! এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আলয় করে দাও।

সূরা আল-বাকারায়ও [১২৬ নং আয়াতে] এ দোআর উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে--

رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ সূরা আল-বাকারায়ও [১২৬ নং আয়াতে]

সূরা বাকারার এই দোআতে بلد শব্দটি ألف ও لام ব্যতীত بلدا বলা হয়েছে। এর অর্থ অনির্দিষ্ট নগরী। এর কারণ হিসেবে কোন কোন মুফাসসির যা বলেন তা এই যে, এ দোআটি যখন করা হয়েছিল, তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দো'আ করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন। এরপর মক্কায় যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন (সূরা ইবরাহীমের)এ আয়াতে বর্ণিত দোআটি করেন। কারণ এর পরে তাঁর দু ছেলে ইসমাঈল ও ইসহাকের কথা উল্লেখ করেছেন। যা দ্বারা বোঝা যায় যে, দোআটি পরেই করা হয়েছে। কারণ ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইসহাকের চেয়ে তের বছরের বড় ছিলেন। আর প্রথম যখন দোআ করেছিলেন তখন ইসমাঈল ও তাঁর মা-এ দু' জনই ছিলেন। আর ইসমাঈল তখন ছিলেন দুগ্ধপোষ্য শিশু। [আল-বাহরুল মুহীত; ইবন কাসীর]

কোন কোন মুফাসসির বলেন, সূরা বাকারার আয়াতে সে দেশ ও দেশের বাসিন্দা সবার নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে, পক্ষান্তরে এ সূরায় শুধু দেশের নিরাপত্তা চাওয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নির্দিষ্ট করে প্রথমে যে দোআ করেন তা হচ্ছে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন।

ইবরাহীম আ প্রথমেই নিরাপত্তার দা করেছেন কারন নিরাপদ পরিবেশ না হলে কিছুই করা সম্ভব নয়। আর তাই আমরা দেখি রাসূল সা ও মদিনায় যাওয়ার পর প্রথমেই নিরাপত্তার জন্য মদিনার গত্র আশে পাশের গত্রদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন বিভিন্ন শর্তে।

এখান থেকে অনেক বড় একটি শিক্ষা তা হলো নিরাপদ পরিবেশের জন্য দা করা গুরুত্বপূর্ণ।

পারিবারিক জীবনেও স্বামী বা স্ত্রী বা সন্তান সন্ততিসহ অন্যান্য সদস্যের জন্য নিরাপদ পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মানুষের জীবনে আল্লাহর দেওয়া অসংখ্য নেয়ামতের মধ্যে 'নিরাপত্তা' বা 'আমান' অন্যতম। এটি এমন এক সম্পদ, যার মূল্য কেবল তা হারিয়ে গেলেই অনুধাবন করা যায়।

ইসলাম কেবল পরকালীন মুক্তির পথই দেখায় না, বরং পৃথিবীতে মানুষের জান, মাল ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে।

<u>নিরাপত্তার অর্থ</u>

নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত শরয়ি পরিভাষা হলো 'আমান'। 'আমান' শব্দের অর্থ হলো ভয়হীনতা, প্রশান্তি ও স্থিরতা।

পারিভাষিক অর্থে, ভবিষ্যতে কোনো অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকাকেই নিরাপত্তা বলা হয়। ইমাম মানাভি (র.)-এর মতে, 'আমান' হলো অন্তরের সেই প্রশান্তি যা ভয়ের অনুপস্থিতিতে তৈরি হয়। (মানাভি, আত-তাওকিফ, পৃষ্ঠা: ৬৩)

<u>ইসলামে নিরাপত্তা</u>

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা কুরাইশ বংশের ওপর তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, '(আল্লাহ) যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে বাঁচিয়ে অন্ন দিয়েছেন এবং ভয় থেকে বাঁচিয়ে নিরাপত্তা দিয়েছেন।' (সুরা কুরাইশ, আয়াত: ৪)

অর্থাৎ খাবার ও নিরাপত্তা—এই দুটি বিষয়ই একটি জাতির স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) নিরাপত্তার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একটি চমৎকার মূলনীতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনসহ নিরাপদে সকালে ঘুম থেকে উঠল, যার শরীর সুস্থ এবং তার কাছে সেই দিনের খাবার আছে—তাকে যেন পুরো পৃথিবীটাই দিয়ে দেওয়া হলো।' (সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৩৪৬)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেছেন, 'আল্লাহ একটি ইনসাফপূর্ণ রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন যদিও তা অমুসলিম হয়, কিন্তু জুলুমবাজ রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন না যদিও তা মুসলিমদের হয়।' (ইবনে তাইমিয়া, মাজমু আল-ফাতাওয়া, ২৮/১৪৬)

এর অর্থ হলো, ন্যায়বিচারই নিরাপত্তার মূল উৎস।

এই মহতী নেয়ামত ধরে রাখার জন্য ইসলামে পাঁচটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে:

১. নিখাদ ঈমান : নির্ভেজাল ও নিখাদ ঈমান মানবজীবনে স্বস্তি ও নিরাপত্তা লাভের প্রধান উপায়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদেরই জন্য এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৮২)

২. আল্লাহর দীনকে আঁকড়ে ধরা: কোরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে চলাই হলো নিরাপত্তার প্রথম শর্ত।আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হলেন যখন তারা বৃক্ষতলে তোমার কাছে বাইআত গ্রহণ করল, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন; তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।' (সুরা : ফাত্হ, আয়াত : ১৮)

৩. ফরজ ইবাদত পালন: যারা আল্লাহর ওপর ইমান আনে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে নিরাপত্তা ও খেলাফত দানের ওয়াদা করেছেন। (সুরা নুর, আয়াত: ৫৫)

৪. জুলুম পরিহার করা: শিরক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম। এছাড়া অন্যের অধিকার হরণ বা জুলুম করা নিরাপত্তার পথে বড় বাধা।

৫. ঐক্যবদ্ধ থাকা: বিশৃঙ্খলা ও বিভেদ এড়িয়ে মুসলিম জামাত ও নেতৃত্বের অনুগত থাকা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য জরুরি। (সুরা নিসা, আয়াত: ৫৯)

৬. ফিতনা থেকে দূরে থাকা: সামাজিক বা রাজনৈতিক অস্থিরতার সময় অহেতুক তাতে জড়িয়ে না পড়ে সংযম প্রদর্শন করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

৭। বেশি বেশি ভালো কাজ করা : নেক আমল বা পুণ্যের কাজ মানুষের জীবন থেকে অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা দূর করে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন...তাদের ভয়ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্য নিরাপত্তা দান করবেন।' (সুরা : নুর, আয়াত : ৫৫)

৮। আল্লাহর ওপর ভরসা করা : যে বান্দা প্রতিটি কাজে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখে আল্লাহ তাঁর জীবনকে সহজ করে দেন। আল্লাহর ঘোষণা হলো, 'তাদের লোকে বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে।

সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কোরো; কিন্তু এটা তাদের ঈমান দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক। তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোনো অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৩-১৭৪)

৯। অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিবাদ করা : যখন সমাজে অন্যায় ও অনিয়মের প্রতিবাদ করা হয় না, তখন সমূহ বিপদ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আল্লাহ বনি ইসরাঈলের প্রতি অভিশাপ ও ধ্বংস আপতিত হওয়ার কারণ তুলে ধরে বলেন, 'তারা যেসব গর্হিত কাজ করত তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত তা

কতই না নিকৃষ্ট।’ (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৭৯) আল্লাহ সবার জীবনে সুখ, স্বস্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা দান করুন। আমিন।

১০। আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করা : আল্লাহর কৃতজ্ঞতা বান্দার জীবনে আল্লাহর অনুগ্রহ বৃদ্ধি করে আর অকৃতজ্ঞতা বান্দার জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধি কেড়ে নেয়। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে আসত সর্বদিক থেকে তার প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তজ্জন্য আল্লাহ তাদেরকে আস্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির আচ্ছাদনের।’ (সুরা : নাহল, আয়াত : ১১২)

নিরাপত্তার অভাবে ধ্বংস হয় সভ্যতা

যখন কোনো সমাজ থেকে নিরাপত্তা হারিয়ে যায়, তখন সেখানে বিশৃঙ্খলা, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা জেঁকে বসে। পবিত্র কোরআনে এমন এক জনপদের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যারা একসময় নিরাপদ ছিল, কিন্তু আল্লাহর নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করায় তারা দুর্ভিক্ষ ও ভয়ের কবলে পড়েছিল। (সুরা নাহল, আয়াত: ১১২)

ইসলাম একটি নিরাপদ ও শান্তিময় পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত জোরালো নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে, নিরাপদ পরিবেশ বলতে কেবল বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা নয়, বরং মানুষের শারীরিক, মানসিক, এবং আত্মিক নিরাপত্তা বোঝায়।

ইসলামে নিরাপদ পরিবেশ গঠনের মূলনীতিগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

<u>ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও শান্তি:</u>

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুসলিম। আর যাকে মানুষ তাদের জান ও মালের জন্য নিরাপদ মনে করে সে-ই প্রকৃত মুমিন।' (বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি)

অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ক্ষতিসাধন করে বা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে সে অভিশপ্ত।' -সুনানে তিরমিজি: ১৯৪১।

<u>পরিচ্ছন্নতা ও ইমান</u>: ইসলামে পরিচ্ছন্নতাকে ইমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। নিজ বাড়ি, রাস্তাঘাট ও পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং যত্রতত্র ময়লা বা ক্ষতিকর বস্তু ফেলা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

<u>প্রকৃতি ও বৃক্ষরোপণ:</u> পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলাম বৃক্ষরোপণকে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। এমনকি যুদ্ধের সময়ও গাছ কাটতে বা ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

<u>অপচয় ও দূষণ রোধ:</u> আল্লাহ তায়ালা অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। পানি, বায়ু বা মাটি দূষিত হয়—এমন যেকোনো কাজ যেমন—অপ্রয়োজনীয় ধোঁয়া, ক্ষতিকর বর্জ্য ও প্লাস্টিক ফেলা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

<u>জীববৈচিত্র্য রক্ষা:</u> পশুপাখি ও জীবজন্তুর প্রতি সদয় আচরণ করতে এবং বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দিতে বা হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে

নিরাপত্তা না থাকলে মানুষের শিক্ষা, অর্থনীতি ও ইবাদত–সবই বাধাগ্রস্ত হয়। ইসলামের পাঁচটি মৌলিক উদ্দেশ্য (দীন, জীবন, মেধা, বংশ ও সম্পদ রক্ষা) কেবল একটি নিরাপদ পরিবেশেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আল্লাহ

তা'আলা নবীর এ দোআ কবুল করেছেন। তিনি অন্যত্র বলেন, “তারা কি দেখে না আমরা 'হারামকে নিরাপদ স্থান করেছি, অথচ এর চারপাশে যেসব মানুষ আছে, তাদের উপর হামলা করা হয়।” [সূরা আল-আনকাবুত: ৬৭] এখানে লক্ষণীয় যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সবকিছুর আগে নিরাপত্তার জন্য দোআ করেছেন। কারণ, যদি কোন স্থানে নিরাপত্তার অভাব হয়, সেখানে দ্বীন-দুনিয়ার কোন কাজই সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয় না। [ফাতহুল কাদীর]

--<u>দ্বিতীয় দোআ এই যে</u>, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। নবীগণ নিস্পাপ। কিন্তু এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোআ করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে নবীগণ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোআ করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য নিজেকেও দোআয় শামিল করে নিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বন্ধুর দো'আ কবুল করেছেন। ফলে তার সন্তানরা শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। [তাবারী; কুরতুবী]

তবে তার বংশধরদের মধ্যে মূর্তিপূজা হবে না এমনটি বলা হয়নি এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামও এমন দোআ করেননি। কারণ, মক্কাবাসীরা সাধারণভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এরই বংশধর। তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। প্রত্যেক দো'আকারীর উচিত তার নিজের ও পিতামাতা ও তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য এ দো'আ করা। [ইবন কাসীর]

‘শিরক’ এর শাব্দিক অর্থ শরীক করা, অংশিদার সাব্যস্ত করা, ভাগাভাগি করা ইত্যাদি। ইংরেজিতে (to share, participate, be partner, associate) ইত্যাদি অর্থ করা হয়। পরিভাষায়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে মহান আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা। সেটা হতে পারে বেশি কিংবা কম। মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাহ, উলুহিয়্যাহ ও সিফাতের সাথে ন্যুনতম অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ‘শিরক’ বলে।

শির্ক থেকে মুক্ত থেকে সাধ্যানুযায়ী ‘আমল করে যাওয়াই মু’ মিনের দায়িত্ব। হাদীসে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা ‘আলা বলেন :

يَا ابْنَ آدَمَ مَهْمَا عَبَدْتَنِي وَرَجَوْتَنِي وَلَمْ تُشْرِكْ بِي شَيْئًا غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَإِنِ اسْتَقْبَلْتَنِي بِمِلْءِ السَّمَاءِ والْأَرْضِ خَطَايَا وَذُنُوبًا اسْتَقْبَلْتُكَ بِمِلْئِهِنَّ مِنَ المَغْفِرَةِ وَأَغْفِرُ لَكَ وَلَا أُبَالِي

‘হে আদম সন্তান! তুমি আমার যতটুকুই ‘ইবাদাত করো এবং ভালো আশা করো যদি তুমি আমার সাথে কোনো কিছুকে অংশী স্থাপন না করো তাহলে তোমার ‘আমল যা-ই হোক না কেন তোমাকে আমি ক্ষমা করে দেবো। তুমি যদি আসমান ও জমিন ভরা অপরাধ ও গুনাহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হও তাহলে আমিও আসমান ও জমিন ভরা ক্ষমা নিয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হবো এবং আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এতে আমি কাউকে পরোয়া করি না।’ সহীহ আল জামি : ৪৩৪১, হাদীসটি সহীহ।

অন্য একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা ‘আলা বলেন :

مَنْ عَلِمَ أَنِّيْ ذُوْ قَدْرَةٍ عَلٰى مَغْفِرَةِ الذُّنُوْبِ غَفَرْتُ لَه وَلَا أُبَالِيْ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا

‘যে ব্যক্তি জানলো ও বিশ্বাস করলো যে আমি গুনাহ মাফ করার ক্ষমতা রাখি এবং আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করলো না তাহলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো, এ ক্ষেত্রে আমি কারও পরোয়া করবো না।’ সহীহ আল জামি ‘ : ৪৩৩০, হাদীসটি সহীহ।

শির্ক কি এবং তা কত প্রকার?

উত্তর: শির্ক হচ্ছে তাওহীদের বিপরীত দিক, শির্ক তিন প্রকার: বড় শির্ক, ছোট শির্ক এবং গোপনীয় শির্ক।

ক: বড় শির্ক চার প্রকার:

১-দো ‘আর ক্ষেত্রে শির্ক,

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

অর্থাৎ: তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তারা শির্কে লিপ্ত হয়। [সূরা আনকাবূত ৬৫]

২- নিয়ত, ইচ্ছা এবং কথার ক্ষেত্রে শির্ক:

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيۡهِمۡ أَعۡمَٰلَهُمۡ فِيهَا وَهُمۡ فِيهَا لَا يُبۡخَسُونَ ١٥ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيۡسَ لَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَٰطِلٞ مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٦ ﴾ [هود: ١٥، ١٦]

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি শুধু পার্থিব জীবন ও এর জাঁকজমক কামনা করে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলির ফল দুনিয়াতেই পরিপূর্ণভাবে প্রদান করে দেই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কোনো কিছুই কম করা হয় না। তারা এমন লোক যে, আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখেরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে। [সূরা হূদ ১৫-১৬]

৩- আনুগত্যের ক্ষেত্রে শির্ক:

আল্লাহ তা ‘আলা বলেন:

﴿ ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهٗا وَٰحِدٗاۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٣١ ﴾ [التوبة: ٣١]

অর্থাৎ: তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্মযাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে এবং মরিয়মের ছেলে ঈসাকেও অথচ তাদের প্রতি শুধু এ আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা' বূদের ইবাদত করবে, যিনি ব্যতীত যোগ্য কোনো উপাসক নেই, বস্তুত: তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র। [সূরা তাওবা ৩১]৪- ভালবাসার ক্ষেত্রে শির্ক:

আল্লাহ তা 'আলা বলেন:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِۗ وَلَوۡ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذۡ يَرَوۡنَ ٱلۡعَذَابَ أَنَّ ٱلۡقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعَذَابِ ١٦٥ ﴾ [البقرة: ١٦٥

অর্থাৎ: এবং মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সদৃস স্থির করে নেয়, তারা আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তাদেরকে ভালবেসে থাকে এবং যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসা অধিক দৃঢ়তর, আর যারা অত্যাচার করেছে তারা যদি শাস্তি অবলোকন করতো তাহলে বুঝতো যে, সমুদয় শক্তি আল্লাহর জন্যে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। [সূরা বাকারা ১৬৫

খ: ছোট শির্ক আর এটি হচ্ছে সামান্য লোকদেখানো

আল্লাহ তা 'আলা বলেন

﴿ فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا ١١٠ ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴾

অর্থাৎ: সূতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে আর তার প্রতিপালকের ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে। [সূরা কাহাফ ১১০]

গ: গোপন শির্ক, এর দলীলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম) বলেন:

(এ উম্মতের মাঝে শির্ক এমন গোপনীয় ভাবে প্রবেশ করে যে ভাবে অন্ধকার রাত্রিতে কালো পাথরে পিপিলিকা হাটলে টের পওয়া যায় না।)

কিছু প্রচলিত শিরক

১. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা।

২. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে কসম করা।

৩. মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বিধানদাতা হিসেবে গ্রহণ করা

৪. আল্লাহ ব্যতীত জীবিত বা মৃত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য মানত করা যেমন পীর, ফকির, মাজারের উদ্দেশ্যে গরু, ছাগল, মুরগী জবাই করা।

৫. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সিজদা দেয়া। যেমন কোনো পীর, ফকির, মাজারে মৃত মানুষকে সিজদা দেয়া।

৬. সালাত, সিয়াম, হাজ্ব, যাকাতসহ অন্যান্য নফল ইবাদত লোক দেখানো উদ্দেশ্যে পালন করা।

৭. মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালমন্দের অধিকারী বলে ধারণা করা।

৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট কিছু চাওয়া, দোয়া বা প্রার্থনা করা যেমন পীর, ফকির, মাজারে গিয়ে চাওয়া।

৯. মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে আলিমুল গাইব বা অদৃশ্যের খবর জানেন বলে বিশ্বাস করা। এমনকি স্বয়ং নবী সা. অদৃশ্যের খবর জানতেন না। যতটুকু আল্লাহ তায়ালা জানাতেন ততটুকুই জানতেন।

১০. কোনো জ্যোতিষী বা গণকের ভাগ্য গণনার জন্য যাওয়া বা তাদের কথা বিশ্বাস করা।

১১. মানুষের কল্যাণ অকল্যাণে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব আছে বলে বিশ্বাস রাখা।

১২. জাদু টোনা, বান বা শিরকি তাবিজ ঝুলানো এবং এমন বিশ্বাস রাখা যে এগুলো মুক্তি দিতে পারে ইত্যাদি।

<u>শিরক থেকে বাঁচার জন্যে প্রতিদিন এই দু ‘আ তিনবার পড়বে</u>

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা আন উশরিকা বিকা ওআনা আ’ লাম ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লা আ’ লাম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে কাউকে শরিক করা থেকে । আর আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ঐ সকল বিষয়ে, যা আমি জানি না।

উৎস(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ; ইবনুস্ সুন্নী হাঃ ২৮৬)(আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদিস নাম্বারঃ ৭২১)

মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। তিনি বলেনঃ হে আবু বকর! নিশ্চয় শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বকর (রাঃ) বলেন, কারো আল্লাহর সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না, তুমি যা বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেনঃ তুমি বলো, “হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই” । (আল-আদাবুল মুফরাদ,হাদিস নাম্বারঃ ৭২১)

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضۡلَلۡنَ کَثِیۡرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنۡ تَبِعَنِیۡ فَاِنَّهٗ مِنِّیۡ ۚ وَ مَنۡ عَصَانِیۡ فَاِنَّکَ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ৩৬

৩৬. হে আমার রব! এ সব মূর্তি তো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। কাজেই যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এখানে পূর্ব আয়াতে বর্ণিত দোআর কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল। অর্থাৎ মূর্তিগুলো মানুষকে আল্লাহর দিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের ভক্তে পরিণত করেছে। মূর্তি যেহেতু অনেকের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে তাই পথভ্রষ্ট করার কাজকে তার কৃতকর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। [কুরতুবী]

বর্তমানে আমাদের সমাজে মুসলিম পরিবারে দেখা যায় মূর্তি পূজা নাই কিন্তু সেখানে আছে নফসের,সম্পদের, শারীরিক সউন্দর্য,সম্পদ,ক্যারিয়ার ইতযাদি

() অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে তথা ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও কৃপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে, তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দকৃম্ৰ নেয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার কৃপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। আর যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফর ও অস্বীকৃতি নেয়া হয়, তবে কাফের ও মুশরিকের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম-কে পূর্বেই দেয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করার সঠিক অর্থ হলোঃ নবীসুলভ দয়া প্রকাশ করা। প্রত্যেক নবীর আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, প্রত্যেক কাফের ঈমান আনুক, তাই আল্লাহ তা'আলাকে "আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু" -একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেননি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ার ব্যবহার করুন।

ঈসা আলাইহিস সালামও স্বীয় উম্মতের কাফেরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেনঃ (وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [আল-মায়েদাঃ ১১৮] অর্থাৎ "আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।" আপনি সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই। [দেখুন, ইবন কাসীর]

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের এ কথা হে রব! এ মুর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। এ আয়াতাংশ এবং ঈসা আলাইহিস সালামের 'যদি আপনি তাদেরকে আযাব দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা' আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেন।

তারপর তিনি তার দু'হাত উপরে উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, হে আল্লাহ! আমার উম্মত। আর কাঁদতে থাকলেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা জিবরীলকে বললেন, হে জিবরীল তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও, অথচ তোমার রব জানেন - তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন তিনি কাঁদছেন? তখন জিবরীল এসে রাসূলকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও জিবরীলকে প্রশ্নোত্তর জানালেন। তখন আল্লাহ বললেন, জিবরীল যাও, মুহাম্মাদের কাছে এবং তাকে বল, আমরা অবশ্যই আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব এবং আপনার জন্য খারাপ কোন কিছু করব না। [মুসলিম: ২০২]

ইমরান ইবনে মায়সারা ও উসায়দ ইবনে যায়দ (রাহঃ) .... ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী (ﷺ) বলেছেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতদের আমার সমীপে পেশ করা হয়। কোন নবী তাঁর অনেক উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবী (ﷺ) কয়েকজন উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। কোন নবীর সঙ্গে রয়েছে দশজন উম্মত। কোন নবীর সঙ্গে পাঁচজন আবার কোন নবী একা একা যাচ্ছেন। হঠাৎ নজর করে দেখি অনেক বড় একটি দল। আমি বললামঃ হে জিবরাঈল! ওরা কি আমার উম্মত? তিনি বললেনঃ না। তবে আপনি উর্ধ্বলোকে নজর করুন! আমি নজর করলাম, হঠাৎ দেখি অনেক বড় একটি দল। তিনি বললেন, ওরা আপনার উম্মত। আর তাদের সামনে রয়েছে সত্তর হাজার লোক, তাদের কোন হিসাব হবে না, হবে না তাদের কোন আযাব। আমি বললাম, কেন? তিনি বললেনঃ তারা কোন দাগ লাগাত না, ঝাড়ফুঁকের শরণাপন্ন হত না এবং কুযাত্রা মানত না। আর তারা কেবল তাদের প্রভূর উপরই ভরসা করত। তখন উক্কাশা ইবনে মিহসান নবী (ﷺ) এর দিকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ আপনি আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ হে আল্লাহ! তুমি একে তাদের অন্তর্ভুক্ত কর। এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার জন্য দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ উক্কাশা তো দু'আর ব্যাপারে তোমার চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছে। সহিহ বুখারী হাদীস নং: ৬০৯৮ আন্তর্জাতিক নং: ৬৫৪১

মুসিলম শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ»

'আমরা সকলের পরে দুনিয়াতে আসলেও কিয়ামতের দিন সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করবো' সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ২০১৭।

''সকল নবীর জন্য এমন একটি দু' আ রয়েছে, যা আল্লাহ কবুল করবেন। দুনিয়াতে সকল নবী আল্লাহর কাছে দু' আ করে নিয়েছেন। আর আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতের সুপারিশের জন্য দু' আটি রেখে দিয়েছি। আমার উম্মতের যে ব্যক্তি শির্ক না করে মৃত্যু বরণ করবে সে ব্যক্তি ইনশা-আল্লাহ তা পাবে' ' । (মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান)

আবূ সা 'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মহান আল্লাহ ডাকবেন, হে আদম (আঃ)! তখন তিনি জবাব দিবেন, আমি হাযির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হতেই। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামীদেরকে বের করে দাও। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামী কারা? আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে নেশাগ্রস্তের মত যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি কঠিন- (হাজ্জঃ ২)। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে সেই একজন কে? তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা তোমাদের মধ্য হতে একজন আর এক হাজারের অবশিষ্ট ইয়াজুজ-মাজুজ হবে। অতঃপর তিনি বললেন, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম। আমি আশা করি, তোমরা সমস্ত জান্নাতবাসীর এক তৃতীয়াংশ হবে। [আবূ সা 'ঈদ (রাঃ) বলেন] আমরা এ সংবাদ শুনে আবার আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি আবার বললেন, আমি আশা করি তোমরা সমস্ত জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে আমরা আবারও আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা তো অন্যান্য

মানুষের তুলনায় এমন, যেমন সাদা ষাঁড়ের দেহে কয়েকটি কালো পশম অথবা কালো ষাঁড়ের শরীরে কয়েকটি সাদা পশম।সহিহ বুখারীঃ (৪৭৪১, ৬৫৩০, ৭৪৮৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩১০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৩১০৮)

رَبَّنَآ اِنِّیۡۤ اَسۡکَنۡتُ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ بِوَادٍ غَیۡرِ ذِیۡ زَرۡعٍ عِنۡدَ بَیۡتِکَ الۡمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا ৩৭ : ১৪
لِیُـقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ فَاجۡعَلۡ اَفۡئِدَۃً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِیۡۤ اِلَیۡهِمۡ وَارۡ زُقۡهُمۡ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمۡ یَشۡکُرُوۡنَ

৩৭. হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে, হে আমাদের রব! এ জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রিযকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিভাবে তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তানকে এ মরুপ্রান্তরে রেখে গেলেন সে ঘটনাটি সহীহ বর্ণনার উপর নির্ভর করে বর্ণনা করা প্রয়োজন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ নারী জাতি সর্বপ্রথম ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর মাতা হাজেরা থেকেই কোমরবন্ধ বানানো শিখেছে। হাজেরা সারা থেকে আপন গর্ভের নিদর্শনাবলী গোপন করার উদ্দেশ্যেই কোমরবন্ধ লাগাতেন। আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাজেরা ও তার শিশুপুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে নির্বাসন দানের জন্য বের হলেন। পথে হাজেরা শিশুকে দুধ পান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাদের উভয়কে নিয়ে যেখানে কাবাঘর অবস্থিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে যমযমের উপরিস্থত এক বিরাট বৃক্ষতলে তাদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব, না ছিল পানির কোনরূপ ব্যবস্থা। অতঃপর সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজ গৃহ অভিমুখে ফিরে চললেন।

ইসমাঈলের মাতা তার পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং চিৎকার করে বলতে লাগলেন, হে ইবরাহীম! কোথায় চলে যাচ্ছেন? আর আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন এমন এক ময়দানে, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী না আছে পানাহারের কোন বস্তু। তিনি বার বার এ কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এর আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তাহলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন। ইবরাহীমও সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে এসে পৌছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাকে দেখতে পাচ্ছিল না, তখন তিনি কাবা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং দু' হাত তুলে এ দোআ করলেনঃ "হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে, হে আমাদের রব! এ জন্যে যে, তারা যেন সালাত কায়েম করে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি অনুরাগী করে দিন এবং ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের রির্যকের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

তখন ইসমাঈলের মা ইসমাঈলকে দুধ খাওয়াতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে মশকে যা পানি ছিল তা ফুরিয়ে গেল। তখন তিনি নিজেও তৃষ্ণার্ত হলেন এবং তার শিশুপুত্রটিও পিপাসায়

কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি দেখতে লাগলেন, শিশুর বুক ধড়ফড় করছে কিংবা বলেছেন, সে জমিনে ছটফট করছে। শিশুপুত্রের দিকে তাকানো তার পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থানের সংলগ্ন পর্বত সাফা' কেই একমাত্র নিকটতম পর্বত হিসেবে পেলেন তারপর তিনি এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে ময়দানের দিকে মুখ করলেন, এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখলেন কাউকে দেখা যায় কি না? কিন্তু না কাউকে তিনি দেখলেন না। তখন দ্রুত সাফা পর্বত থেকে নেমে পড়লেন। যখন তিনি নিচু ময়দানে পৌছলেন তখন আপন কামিজের এক দিক তুলে একজন শ্রান্ত-ক্লান্ত ব্যক্তির ন্যায় দৌড়ে চললেন। শেষে ময়দান অতিক্রম করলেন, মারওয়া পাহাড়ের নিকট এসে গেলেন এবং তার উপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপর চারদিকে নজর করলেন, কাউকে দেখতে পান কি না

কিন্তু কাউকে দেখলেন না তিনি অনুরূপভাবে সাতবার করলেন। ... তারপর যখন তিনি শেষবার মারওয়ার পাহাড়ের উপর উঠলেন, একটি আওয়াজ শুনলেন। তখন নিজেকেই নিজে বললেন, একটু অপেক্ষা কর। তিনি কান দিলেন। আবারও শব্দ শুনলেন। তখন বললেন, তোমার আওয়াজ তো শুনছি। যদি তোমার কাছে উদ্ধার করার মত কিছু থাকে আমাকে উদ্ধার কর। অকস্মাৎ তিনি, যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেলেন। সে ফেরেশতা আপন পায়ের গোড়ালি দ্বারা আঘাত করলেন। কিংবা তিনি বলেছেন-আপন ডানা দ্বারা আঘাত হানলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি উপচে উঠতে লাগল। হাজেরা এর চার পাশে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউযের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার অঞ্জলি ভরার পরে পানি উছলে উঠতে লাগল। ... তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং শিশুপুত্রকেও দুধ পান করালেন। তখন ফেরেশতা তাকে বললেন, ধ্বংসের কোন আশংকা আপনি করবেন না। কেননা, এখানেই আল্লাহর ঘর রয়েছে। এই শিশু তার পিতার সাথে মিলে এটি নির্মাণ করবে এবং আল্লাহ তার পরিজনকে কখনও ধ্বংস করবেন না। ঐ সময় বায়তুল্লাহ জমিন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল। বন্যার পানি আসতো এবং ডান বাম থেকে ভেঙ্গে নিয়ে যেতো।

হাজেরা এভাবেই দিন-যাপন করছিলেন। শেষ পর্যন্ত "জুরহুম" গোত্রের একদল লোক তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে গেল। কিংবা তিনি বলেছেন, 'জুরহুম' গোত্রের কিছু লোক 'কাদা' এর পথে এ দিক দিয়ে আসছিল। তারা মক্কার নিচুভূমিতে অবতরণ করল এবং দেখতে পেল কতগুলো পাখি চক্রাকারে উড়ছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপরই ঘুরছে। অথচ আমরা এ ময়দানে বহুকাল কাটিয়েছি। কিন্তু কোন পানি এখানে ছিল না। তারপর তারা একজন বা দু'জন লোক সেখানে পাঠাল। তারা গিয়েই পানি দেখতে পেল। ফিরে এসে সবাইকে পানির খবর দিল। সবাই সেদিকে অগ্রসর হলো। বর্ণনাকারী বলেনঃ ইসমাঈলের মাতা পানির কাছে বসা ছিলেন। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই; আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি?

তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তবে এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা হ্যাঁ বলে সম্মতি জানালো। ইবনে আব্বাস বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাতার জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিল, তিনিও মানুষের সাহচর্য কামনা করছিলেন। ফলে আগন্তুক দলটি সেখানে বসতি স্থাপন করলো এবং পরিবার-পরিজনের কাছে খবর পাঠালো, তারাও এসে সেখানে বসবাস শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সেখানে তাদের কয়েকটি খান্দান জন্ম নিল। ইসমাঈলও বড় হলেন, তাদের থেকে আরবী শিখলেন। জওয়ান হলে তিনি তাদের অধিক আগ্রহের বস্তু ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। যখন তিনি যৌবনপ্রাপ্ত

হলেন, তখন তারা তাদেরই এক মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল। বিয়ের পরে ইসমাঈলের মাতা মারা গেলেন। ... (ইতিমধ্যে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু' বার এসে ইসমাঈল ও স্ত্রীর খোজ নিলেন এবং এ ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দিলেন)

পুনরায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর ইচ্ছায় কিছু দিন এদের থেকে দূরে রইলেন। এরপর আবার তাদের কাছে আসলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যমযমের কাছে একটি গাছের নীচে বসে নিজের তীর মেরামত করছিলেন। পিতাকে যখন আসতে দেখলেন, দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। অতঃপর একজন পিতা-পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাত হলে যা করে তারা তা-ই করলেন। তারপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেনঃ হে ইসমাঈল! আল্লাহ আমাকে একটি কাজের হুকুম দিয়েছেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জবাব দিলেন, আপনার পরওয়ারদিগার আপনাকে যা আদেশ করেছেন তা করে ফেলুন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেনঃ তুমি আমাকে সাহায্য করবে কি? ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, হ্যাঁ। আমি অবশ্যই আপনার সাহায্য করব ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে এর চারপাশ ঘেরাও করে একটি ঘর বানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এ বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন এবং স্থানটি দেখালেন।

তখনি তারা উভয়ে কাবা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পাথর যোগান দিতেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম গাথুনি করতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল, তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীম নামক মশহুর পাথরটি আনলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জন্য তা যথাস্থানে রাখলেন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর উপর দাঁড়িয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন এবং ইসমাঈল তাকে পাথর যোগান দিতে লাগলেন। আর উভয়ে এ দো'আ করতে থাকলেনঃ "হে আমাদের রব! আমাদের থেকে (এ কাজটুকু) কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।" আবার তারা উভয়ে ইমারত নির্মাণ করতে লাগলেন। তারা কাবা ঘরের চারদিকে ঘুরছিলেন এবং উভয়ে এ দোআ করছিলেনঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আল-বাকারাহঃ ১২৭], [বুখারীঃ ৩৩৬৪]

() ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে শুষ্ক প্রান্তরে ছেড়ে আপনি শামে চলে যান, তখন তিনি আবেদন করেছিলেন যে, তাদেরকে ফলমূল দান করুন; যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররামায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুস্কর।

() এ আয়াতাংশ থেকে কেউ কেউ প্রমাণ নিতে চেষ্টা করেছেন যে, বায়তুল্লাহর ভিত্তি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন মুফাসসির এ আয়াতের এবং বিভিন্ন বর্ণনার ভিত্তিতে বলেনঃ সর্বপ্রথম আদম 'আলাইহিস সালাম বায়তুল্লাহ নি্মৰাণ করেন। নূহের মহাপ্লাবনের পর ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই ভিত্তির উপরেই বায়তুল্লাহ পূননির্মাণের আদেশ দেয়া হয়। জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। [কুরতুবী] তবে সহীহ কোন দলীল সরাসরি এটা প্রমাণ করে না যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পূর্বে কেউ কা'বা ঘর বানিয়েছে। বিভিন্ন দুর্বল বর্ণনায় আদম আলাইহিস সালাম এবং পরবর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু জাতির মক্কায় আসার কথা এসেছে, কিন্তু সেগুলো সহীহ হাদীসের বিপরীতে টিকে না। যেখানে

সরাসরি সহীহ হাদীসে এসেছে যে, "প্রথম মাসজিদ বাইতুল্লাহিল হারাম তারপর বাইতুল মাকদিস, আর এ দুয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো চল্লিশ বছরের" । [দেখুনঃ মুসলিমঃ ৫২০]

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মিত এই প্রাচীর জাহেলিয়াত যুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরাইশরা তা নতুনভাবে নির্মান করে। এ নির্মাণকাজে আবু তালেবের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও নবুওয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন। [মুসলিমঃ ৩৪০] এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ محرم উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহর মধ্যে উভয় বিশেষণই বিদ্যমান। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রুর কবল থেকে সুরক্ষিত। [কুরতুবী]

() ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দো'আর প্রারম্ভে পুত্র ও তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম সালাত কায়েমকারী করার দোআ করেন। ইবন জারীর বলেন, এখানে বায়তুল্লাহকে কেন হারাম বা সম্মানিত/সুরক্ষিত করা হয়েছে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে আর সেটা হচ্ছে, যাতে মানুষ সেখানে সালাত আদায় করতে সমর্থ হয়। [তাবারী; ইবন কাসীর] তাছাড়া সালাত সবচেয়ে উত্তম ইবাদাত। [আল-বাহরুল মুহীত] এর দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় মঙ্গল সাধিত হয়। যে এ সালাত ঠিকভাবে কায়েম রাখতে পারবে সে দ্বীন কায়েম রাখতে পারবে। [সা'দী] এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে সালাতের অনুবর্তী করে দেয়, তবে এটাই সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্ববৃহৎ সহানুভূতি ও হিতাকাংখা হবে।

() أَفْئِدَة শব্দটি فؤاد এর বহুবচন। এর অর্থ অন্তর। এখানে أَفْئِدَة শব্দটি نكرة এবং তার সাথে من অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা تبعيض ও تقليل এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর] কোন কোন তাফসীরবিদ বলেনঃ যদি এ দোআয় কিছু সংখ্যক অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত; তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইয়াহুদী, নাসারা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভীড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোআয় বলেছেনঃ কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। যাতে করে শুধু মুসলিমরাই এখানে আসে। [ইবন কাসীর]

() যাতে করে তারা এ ফল-মুল খেয়ে আপনার ইবাদতের জন্য শক্তি লাভ করতে পারে। [ইবন কাসীর] আল্লাহ তা'আলা এ দোআ কবুল করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "আমরা কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমাদের দেয়া রিযকস্বরূপ।" [সূরা আল-কাসাসঃ ৭৫]এ দোআর প্রভাবেই মক্কা মুকাররামা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না। এ দোআর বরকতেই সব যুগে সব ধরনের ফল, ফসল ও অন্যান্য জীবন ধারণ সামগ্রী সেখানে পৌছে থাকে। [কুরতুবী]

() এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোআ এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে সালাতের অনুবর্তিতা দ্বারা দোআ শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ আনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলিমের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যান-ধারণার উপর আখেরাতের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, যতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَاۤ اِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُخۡفِیۡ وَ مَا نُعۡلِنُ ؕ وَ مَا یَخۡفٰی عَلَی اللّٰهِ مِنۡ شَیۡءٍ فِی الۡاَرۡضِ وَ لَا فِی السَّمَآءِ ৩৮ : ১৪

৩৮. হে আমাদের রব! আপনি তো জানেন যা আমরা গোপন করি ও যা আমরা প্রকাশ করি; আর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন নেই, না যমীনে না আসমানে

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দো'আ সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমার আন্তরিক অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। আপনি আমার এ দো' আর উদ্দেশ্য ভাল করেই জানেন। আপনি জানেন যে, আমি এ দোআ দ্বারা কেবল আপনার জন্য ইখলাস ও সন্তুষ্টিই কামনা করছি। [তাবারী; ইবন কাসীর] 'আন্তরিক অবস্থা' বলতে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসম্বল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিয়েছিল। [কুরতুবী] আর 'বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন' বলে স্পষ্টত: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দোআই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের শেষে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও আন্তরিক অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূ-মণ্ডল ও নভোমণ্ডলে কোন অবস্থাই তার অজ্ঞাত নয়। অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মুখে যা কিছু বলছি তা আপনি শুনছেন এবং যেসব আবেগ-অনুভূতি আমার হৃদয় অভ্যন্তরে লুকিয়ে আছে তাও আপনি জানেন।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ وَهَبَ لِیۡ عَلَی الۡکِبَرِ اِسۡمٰعِیۡلَ وَ اِسۡحٰقَ ؕ اِنَّ رَبِّیۡ لَسَمِیۡعُ الدُّعَآءِ ৩৯ : ১৪

৩৯. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন। নিশ্চয় আমার রব দোআ শ্রবণকারী।

এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দো'আর পরিশিষ্ট। কেননা, দো'আর অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দো'আর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এস্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নেয়ামতের শোকর আদায় করেছেন, নেয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ধক্যের বয়সে আল্লাহ তা'আলা তার দো'আ কবুল করে তাকে সুসন্তান ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাযত করুন। অবশেষে (إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ) বলে প্রশংসা বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয় আমার রব দোআ শ্রবণকারী তথা কবুলকারী।

رَبِّ اجۡعَلۡنِیۡ مُقِیۡمَ الصَّلٰوۃِ وَ مِنۡ ذُرِّیَّتِیۡ ٭ۖ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلۡ دُعَآءِ ৪০ : ১৪

৪০. হে আমার রব! আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও। হে আমাদের রব! আর আমার দো'আ কবুল করুন।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোআয় মশগুল হয়ে যানঃ (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ) এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের জন্য সালাত কায়েম রাখার দোআ করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা! আমার দোআ কবুল করুন। এখানে সালাতে কায়েম রাখার অর্থ, সালাতের হিফাযতকারী এবং এর সীমারেখা যথাযথভাবে কায়েম করা বুঝানো হয়েছে। [ইবন কাসীর]

নিজের সাথে স্বীয় সন্তানদের জন্যও দু' আ করলেন। ইতিপূর্বেও নিজের সাথে স্বীয় সন্তানদের জন্য দু' আ করলেন যে, তাদেরকে পাথরের মূর্তিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখো। এ থেকে জানা গেল যে, দ্বীনের আহবায়কদেরকে স্বীয় পরিবারের হিদায়াত এবং তাদের দ্বীনী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে উদাসীন থাকা উচিত নয়। বরং দাওয়াত ও তবলীগে তাদেরকে প্রাথমিক পর্যায়ে রাখা উচিত।

যেমন মহান আল্লাহ স্বীয় শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাঃ)-কেও নির্দেশ দিয়েছেন: وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, স্বীয় নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর। (সূরা শু 'আরা ২১৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ৪১ : ১৪

৪১. হে আমাদের রব যেদিন হিসেব অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোআ করলেন, 'হে আমার রব! আমাকে আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারাজীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। এতে তিনি মাতা-পিতার জন্যও মাগফেরাতের দোআ করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফের ছিল, তা কুরআনুল কারীমেই উল্লেখিত রয়েছে। সম্ভবতঃ এ দোআটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-কে কাফেরদের জন্য দোআ করতে নিষেধ করা হয়নি। [ইবন কাসীর]

হযরত ইবরাহীম (আ) স্বদেশ ভূমি থেকে বের হবার সময় سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي (অর্থাৎ "আমি তোমার জন্য আমার রবের কাছে দোয়া করবো।" -তাওবাঃ ১১৪) বলে নিজের বাপের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তারি ভিত্তিতে তিনি মাগফেরাতের দোয়ার মধ্যে নিজের বাপকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন তিনি অনুভব করলেন যে, তাঁর বাপ তো আল্লাহর দুশমন ছিল তখন আবার সুস্পষ্টভাবে এ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিলেন।

ইকরাম হোসাইন লেখা থেকে নেয়া নীচের অংশঃ

সূরা ইবরাহীম — একজন বাবার ৫টা দোয়া যা প্রতিটা মা-বাবার মুখস্থ রাখা দরকার

সন্তানের জন্য আপনি কী কী করেছেন?

ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। প্রাইভেট টিউটর রেখেছেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়েছেন। রাত জেগে পাখা করেছেন। নিজের শখ ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন — সন্তানের জন্য কি দোয়া করেছেন?

সেজদায় গিয়ে কি সন্তানের নাম ধরে কেঁদেছেন? তাহাজ্জুদে কি সন্তানের হেদায়াতের জন্য চোখের পানি ফেলেছেন?

টাকা দিয়ে সন্তানকে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারবেন। কিন্তু নামাজী বানাতে পারবেন? দ্বীনদার বানাতে পারবেন? জান্নাতী বানাতে পারবেন?

সেটা শুধু আল্লাহ পারেন। আর আল্লাহর কাছে চাইতে হয় দোয়া দিয়ে।

কুরআনে একজন বাবা আছেন — যিনি সন্তানের জন্য এমন ৫টা দোয়া করেছেন যা শুনলে চোখে পানি আসে। তিনি টাকা চাননি, ক্ষমতা চাননি, প্রাসাদ চাননি। চেয়েছেন — আমার সন্তান যেন নামাজী হয়। আমার পরিবার যেন জান্নাতী হয়।

সেই বাবা — ইবরাহীম (আ.)। আর সেই দোয়াগুলো আছে সূরা ইবরাহীমে।

এই সূরার শেষ অংশে ইবরাহীম (আ.)-এর ৫টা দোয়া পরপর এসেছে — ৩৫ থেকে ৪১ আয়াত পর্যন্ত। একজন বাবার হৃদয় থেকে বের হওয়া দোয়া — যা আল্লাহ কুরআনে সংরক্ষণ করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত।

দোয়া ১: আমার পরিবারকে নিরাপদ রাখুন

ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী হাজেরা ও শিশু ইসমাঈলকে মক্কার জনমানবশূন্য মরুভূমিতে রেখে এসেছেন। সেখানে কিছু নেই — পানি নেই, ছায়া নেই, মানুষ নেই।

একজন বাবার বুকে কেমন লাগছিল? কিন্তু এটা আল্লাহর নির্দেশ। তিনি মানলেন। আর ফিরে গিয়ে দোয়া করলেন —

رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ

উচ্চারণ: রাব্বিজআল হাযাল বালাদা আমিনান ওয়াজনুবনি ওয়া বানিইয়্যা আন নাবুদাল আসনাম।

"হে আমার রব, এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন।"

(সূরা ইবরাহীম: ৩৫)

দুটো চাওয়া একসাথে — শহরের নিরাপত্তা আর শিরক থেকে সুরক্ষা।

খেয়াল করুন — ইবরাহীম (আ.) শুধু শারীরিক নিরাপত্তা চাননি। চেয়েছেন ঈমানের নিরাপত্তা — "মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও।" কারণ শরীর বিপদে পড়লে দুনিয়া নষ্ট হয়। কিন্তু ঈমান বিপদে পড়লে আখিরাত নষ্ট হয়।

আল্লাহ কী দিলেন? সেই মরুভূমি আজ মক্কা — পৃথিবীর সবচেয়ে নিরাপদ ও পবিত্র শহর।

কখন পড়বেন? সন্তানের জন্য যখনই ভয় লাগে — রাস্তায় বের হলে, স্কুলে গেলে, বিদেশে থাকলে। আর সবচেয়ে বড় ভয় — সন্তান যেন শিরক, কুফর, বিদআত থেকে বাঁচে।

দোয়া ২: মানুষের হৃদয় আমার পরিবারের দিকে ঝুঁকাও

ইবরাহীম (আ.) পরিবারকে মরুভূমিতে রেখে এসেছেন। সেখানে কেউ নেই। কে তাদের সাহায্য করবে? কে খাবার দেবে? কে সঙ্গ দেবে?

তিনি আল্লাহর কাছে বললেন —

فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ

উচ্চারণ: ফাজআল আফইদাতাম মিনান নাসি তাহওয়ি ইলাইহিম ওয়ারযুকহুম মিনাস সামারাত।

"মানুষের হৃদয়কে তাদের দিকে আকৃষ্ট করুন এবং তাদের ফলমূল দিয়ে রিজিক দান করুন।"

(সূরা ইবরাহীম: ৩৭)

"তাহওয়ি" শব্দটা অসাধারণ — এর মানে "ঝুঁকে পড়া", "ছুটে যাওয়া", "টানা পড়া।" ইবরাহীম (আ.) চেয়েছেন — মানুষের হৃদয় যেন তাঁর পরিবারের দিকে টানা পড়ে।

আল্লাহ কী দিলেন? আজ প্রতিবছর লাখো মানুষ মক্কায় ছুটে যায়। হজে, উমরায়। হৃদয় টানে। এটা ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফল।

কখন পড়বেন? যখন সন্তানকে মানুষ পছন্দ করে না। যখন সন্তান একা, বন্ধুহীন। যখন চান মানুষ আপনার পরিবারকে ভালোবাসুক। আর রিজিকের চিন্তায় — "ওয়ারযুকহুম" — তাদের রিজিক দিন।

দোয়া ৩: আমাকে ও আমার সন্তানদের নামাজী বানান

এটা ইবরাহীম (আ.)-এর সবচেয়ে বিখ্যাত দোয়াগুলোর একটা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

উচ্চারণ: রাব্বিজআলনি মুকীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিইয়্যাতি, রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ।

"হে আমার রব, আমাকে এবং আমার বংশধরদের নামাজ কায়েমকারী বানান। হে আমাদের রব, আমার দোয়া কবুল করুন।"

(সূরা ইবরাহীম: ৪০)

ইবরাহীম (আ.) কী চেয়েছেন? টাকা? না। বড় বাড়ি? না। সন্তান ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হোক? না।

"মুকীমাস সালাহ" — নামাজ কায়েমকারী। এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় চাওয়া।

আর "ওয়া মিন যুররিইয়্যাতি" — শুধু নিজে না, আমার বংশধরদেরও। সন্তান, নাতি-নাতনি, তাদের সন্তান — পুরো বংশ।

কখন পড়বেন? প্রতি ফরজ নামাজের শেষ বৈঠকে, সালাম ফেরানোর আগে। প্রতিদিন। কারণ নামাজী সন্তান পাওয়াই সবচেয়ে বড় সম্পদ।

দোয়া ৪: আমাকে ও আমার পিতামাতাকে ক্ষমা করুন

ইবরাহীম (আ.) শুধু সন্তানের কথা ভাবেননি — পিতামাতার কথাও ভেবেছেন।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ: রাব্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মুমিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব।

"হে আমাদের রব, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন — যেদিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে।"(সূরা ইবরাহীম: ৪১)

তিনটা স্তর — নিজে, পিতামাতা, সকল মুমিন। আর কখনের জন্য? "ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব" — হিসাবের দিনের জন্য।

সেদিন কোনো টাকা কাজে আসবে না। কোনো সন্তান কাজে আসবে না। কোনো ক্ষমতা কাজে আসবে না। শুধু কাজে আসবে — আল্লাহর ক্ষমা।

কখন পড়বেন? প্রতিদিন। প্রতি নামাজের পর। বিশেষ করে মা-বাবা বেঁচে থাকলে তাদের জন্য, মারা গেলে তাদের মাগফিরাতের জন্য।

দোয়া ৫: আমার দোয়া কবুল করুন

৫টা দোয়ার মধ্যে এটা সবচেয়ে ছোট — কিন্তু সবচেয়ে গভীর। তৃতীয় দোয়ার শেষাংশে এটা আছে —

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

উচ্চারণ: রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ।

"হে আমাদের রব, আমার দোয়া কবুল করুন।"(সূরা ইবরাহীম: ৪০)

ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর খলীল — অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনি আল্লাহর নির্দেশে সন্তান কুরবানি দিতে রাজি হয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশে পরিবারকে মরুভূমিতে রেখে এসেছেন। কাবা নির্মাণ করেছেন। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

এত বড় নবী — তারপরও বলছেন, "আমার দোয়া কবুল করুন।"

কারণ তিনি জানতেন — দোয়া কবুল করা আল্লাহর ইচ্ছা। আমার যোগ্যতায় না — আল্লাহর দয়ায়।

কখন পড়বেন? প্রতিটা দোয়ার শেষে। যেকোনো দোয়া করুন — শেষে বলুন "রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ।" এটা দোয়ার সিলমোহর।

৫টা দোয়া — এক নজরে

দোয়া ১ — নিরাপত্তা ও শিরক থেকে সুরক্ষা:

"রাব্বিজআল হাযাল বালাদা আমিনান"

দোয়া ২ — মানুষের ভালোবাসা ও রিজিক:

"ফাজআল আফইদাতাম মিনান নাসি তাহওয়ি ইলাইহিম"

দোয়া ৩ — নামাজী সন্তান:

"রাব্বিজআলনি মুকীমাস সালাতি ওয়া মিন যুররিইয়্যাতি"

দোয়া ৪ — হিসাবের দিনে ক্ষমা:

"রাব্বানাগফিরলি ওয়ালিওয়ালিদাইয়্যা"

দোয়া ৫ — দোয়া কবুলের আকুতি:

"রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দুআ"

৫টা দোয়া। একজন বাবার। কিন্তু প্রতিটা দোয়া প্রতিটা মা-বাবার জন্য।

ইবরাহীম (আ.) সন্তানকে কুরবানি দিতে রাজি হয়েছেন — তারপরও সন্তানের জন্য দোয়া করেছেন। পরিবারকে মরুভূমিতে রেখেছেন — তারপরও তাদের রিজিকের জন্য কেঁদেছেন। কাবা নির্মাণ করেছেন — তারপরও "আমার দোয়া কবুল করুন" বলেছেন।